প্রবন্ধ

ভারতের মহাকাশ গবেষণা—কিছু প্রশ্ন

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

প্রস্তাবনা

পরাধীন ভারতে জ্ঞানচর্চাকে সেকালের বিদ্বৎসমাজ জাতীয়তাবাদী ধারণার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন জ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান গবেষণা এবং সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে ভারতকে 'জগৎসভায়' শ্রেষ্ঠ আসন দেবেন। তাই আমরা দেখি, বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যায় ভারতীয় বিদ্বজ্জনেরা সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেছিলেন পরাধীন ভারতে। এই যোগাযোগটি মোটেই আকস্মিক নয়। সেই সময়কার বিজ্ঞানীরা দেশপ্রেমিক ছিলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ ছিল।

এই অবস্থার একটি গুণগত পরিবর্তন ঘটে গত শতকের চল্লিশের দশক থেকে। প্রত্যক্ষ ইংরাজ রাজত্ব অবসানের ইঙ্গিত যখন পাওয়া গেল, তখন ভারতের এলিট শ্রেণীর যে অংশটি রাজত্ব চালানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল, তাদের কাছে দেশপ্রেম, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে আত্মনির্ভরতা ইত্যাদি বিষয়গুলি গৌণ হয়ে ওঠে। তারা চেয়েছিল পূর্বতন 'প্রভুর' সঙ্গে সমঝোতা, সংঘাত নয়। ১৯৪৭-এর পরের সমগ্র নীতিমালা এই সমঝোতার সংকেতবাহী।

এই সমঝোতার চূড়ান্ত বিকৃতরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি তথাকথিত আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রটিতে। এই ক্ষেত্রটিতে যাবতীয় লগ্নি ঘটছে বিদেশি সহায়তায়, বিদেশের মুখ চেয়ে। দেশীয় গবেষণার স্রোতটিকে রুদ্ধ করে দিয়ে করদাতা জনগণের রক্ত জল করা অর্থ অপচয় হচ্ছে বিজ্ঞানের সামরিকীকরণের মাধ্যমে। এতে লাভের গুড় খাচ্ছে যুদ্ধবাজ ব্যবসায়ী লবি-টি। এই নিবন্ধে আমরা দেখাবো কেমন করে মৌলিক গবেষণার নামে করদাতা জনগণের টাকায় সমরাস্ত্র-গবেষণা হচ্ছে, কীভাবে স্বয়ম্ভরতার পরিবর্তে বিদেশি মুখাপেক্ষিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শেষ বিচারে কীভাবে জনগণের জন্য কল্যাণকর প্রকল্পগুলির টাকা সরিয়ে অপ্রমাণিত প্রযুক্তিতে লগ্নি হচ্ছে। সামাজিক কল্যাণকর খাতের জন্য বরাদ্দ অর্থ যুদ্ধের খাতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

১৯৪৪ সালে অবিভক্ত ভারতের বোম্বেতে দোরাব্‌জী টাটা গোষ্ঠীর অর্থানুকূল্যে পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পত্তন হয়। পরে আসে মহাকাশ গবেষণা এবং এই দুই বিশেষ বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও নানান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের প্রয়োজনে যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলিতে রকেট প্রযুক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। রকেট প্রযুক্তি এবং নিউক্লিয়ার প্রযুক্তির অগ্রগতির পাশাপাশি এই দুই বিষয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নিবন্ধে আমাদের দৃষ্টি থাকবে ঠিক কেমনভাবে মহাকাশ বিজ্ঞানের মতো একটি মৌলিক গবেষণার বিষয়ের সমরায়ণ ঘটেছে আমাদের দেশে— ঠিক যেমনটি ঘটেছে অন্যান্য দেশেও। পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যেমন মৌলিক গবেষণার নামে গড়ে উঠেছে নিয়ন্ত্রণাধীন পরমাণু চুল্লি— তার হাত ধরে এসেছে নিয়ন্ত্রণহীন পরমাণু চুল্লি, অন্য কথায় যাকে বলা হয় পরমাণু বোমা। আজকের বিশ্বে নিয়ন্ত্রিত পরমাণু চুল্লির মালিক প্রতিটি দেশ হয় প্রকাশ্যে নয়তো গোপনে পরমাণু বোমার অধিকারী। ঠিক তেমনি, আজকের দুনিয়ায় যে সমস্ত দেশের মহাকাশ গবেষণা প্রকল্প রয়েছে, ব্যতিক্রমহীনভাবে সেই সমস্ত দেশের হাতে এসেছে ক্ষেপণাস্ত্র; এবং সেই ক্ষেপণাস্ত্র ঐ সমস্ত দেশের যুদ্ধাস্ত্র এবং সমর-সম্ভারের অংশ হয়ে উঠেছে। এটি একটি ঐতিহাসিক তথ্য। এই তথ্যটি আমাদের এই দুই আপাতভাবে ভিন্ন প্রযুক্তির একীকরণটি বুঝতে সাহায্য করবে। আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্য কোনভাবেই ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের খাটো করা নয়, তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তিকে নস্যাৎ করাও নয়, শুধু দেখানো যে সামাজিক প্রেক্ষিতহীন মৌলিক গবেষণাও কীভাবে মুনাফা এবং যুদ্ধবাজদের সেবায় নিয়োজিত হতে পারে।

ভারতের মহাকাশ গবেষণা— গোড়ার কথা

টাটা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মুনাফার তাড়না চরিতার্থ করার লক্ষ্যে জওহরলাল নেহরুর সস্নেহ প্রশ্রয়ে ১৯৪৪ সালে হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা (বোম্বে শহরে) ভারতে পরমাণু গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করেন। অন্য একটি সমান্তরাল প্রক্রিয়ায়, ভারত সরকারের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার গড়ে ওঠে পার্শীদের বাণিজ্যের পীঠস্থান তৎকালীন বোম্বে প্রেসিডেন্সির আমেদাবাদ শহরে। ১৯৪৭ সালে আমেদাবাদে ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি গড়ে তোলেন বিক্রম সারাভাই, যা কালক্রমে ভারতের 'অসামরিক মহাকাশ গবেষণা'-র কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মনে রাখা দরকার, সারাভাই গোষ্ঠী নানান ব্যবসায়িক স্বার্থে ইংরাজ বণিকদের আর্থিক স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

প্রথম থেকেই ভাবা যেমন ব্রিটেনের ফেলে দেওয়া প্রযুক্তি, ফেলে দেওয়া মালমশলা বেশি দামে কিনে নিয়ে তা ব্যবহার করে ব্রিটেনের অনুসারী পরমাণু প্রকল্প গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, সারাভাই ঠিক তেমন রাস্তা নেন নি। সারা পৃথিবীতে ততদিনে মহাকাশ গবেষণা এবং ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের মধ্যে অন্তরঙ্গ যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী মার্কিন দেশ, পরাজিত জার্মানির উন্নত মহাকাশ গবেষণা, বিশেষত যুদ্ধের প্রয়োজনে উদ্ভূত চালকহীন ভি-১ এবং ভি-২ রকেট প্রযুক্তি চুরি করে ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ ও তা পরীক্ষামূলক ক্ষেপণ শুরু

করেছে, এবং তার মাধ্যমে মহাকাশ গবেষণা ও প্রযুক্তির সঙ্গে যুদ্ধ ও অস্ত্র-নির্মাণের আন্তঃসম্পর্ক প্রকাশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এমনই এক পশ্চাৎভূমির ওপর দাঁড়িয়ে ১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারি ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা ভারতের প্রতিরক্ষা বিষয়ক যাবতীয় মৌলিক ও ফলিত গবেষণাকে সংহত করার উদ্দেশ্যে ভারতের প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান সংগঠন (ডিফেন্স সায়েন্স অর্গাইনাইজেশন)-এর সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর টেকনিক্যাল ডেভলপমেন্ট এস্টাবলিশমেন্ট এবং ডিরেক্টরেট অফ টেকনিক্যাল ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাকশনকে জুড়ে দেয়। (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয় কমবেশি এক দশক আগে)। এই নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা কেন্দ্রের নাম দেওয়া হয় 'প্রতিরক্ষা গবেষণা ও বিজ্ঞান সংগঠন' বা 'ডিফেন্স রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন', সংক্ষেপে *ডিআরডিও*। জন্মলগ্নে এই *ডিআরডিও* প্রকৃত অর্থেই একটি ক্ষুদ্র গবেষণা সংস্থা ছিল— তাদের আওতায় মাত্র ১০টি গবেষণাগারে 'প্রতিরক্ষা ও সমরাস্ত্র বিষয়ক' গবেষণা চলতে থাকে। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর মেজর জেনারেল বি ডি কাপুর এই সংগঠনের মুখ্য কনট্রোলার নিযুক্ত হন। প্রথম থেকেই সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ মহাকাশ গবেষণার এই বিশেষ ক্ষেত্রটিকে সমরাস্ত্রমুখী করে তুলেছে। সংগঠনটি যখন ভ্রূণাবস্থায়, 'প্রতিরক্ষা বিষয়ক' গবেষণার দিশা যখন সবে নির্দিষ্ট হচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই ভারতের সংসদ মন্ত্রীগোষ্ঠীর মারফত *ডিআরডিও*-র মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত গবেষণার জন্য একটি গবেষণাগোষ্ঠী গঠনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেন। এই গবেষণার ফসল যাতে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী দ্রুত কাজে লাগাতে পারে, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা এই গবেষক গোষ্ঠীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রকল্পে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী জওহরলাল নেহরু-র খুবই উৎসাহ ছিল। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরামর্শদাতা, বিজ্ঞানী ডি এস কোঠারির মারফত তিনি এই বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখতেন।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে দেখা যায়, ক্ষেপণাস্ত্র বিষয়ক গবেষণার অগ্রগতি এতটাই হয়েছে যে তাকে গবেষণাগোষ্ঠীর স্তর থেকে একটি সাংগঠনিক স্তরে উন্নীত করতে না পারলে মৌলিক গবেষণার ফলিত দিকটি রূপায়িত করার কাজটি কঠিন হয়ে পড়বে। ভারতের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন এবং তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক পরামর্শদাতা অধ্যাপক কোঠারি পুরো ব্যবস্থাটি রাজধানী দিল্লির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনার পরিকল্পনা করেন। বি এন সিং-এর নেতৃত্বে নয়া দিল্লিতে একটি নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণার গোষ্ঠী গঠিত হয়— তার নাম দেওয়া হয় ডিফেন্স সায়েন্স ল্যাবরেটরি বা *ডিএসএল*। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক অধ্যাপক ভাবা-র পরমাণু গবেষণা প্রকল্পের মতো এই ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণা ক্ষেত্রেও বিপুল পরিমাণ অর্থ জোগান দেয়। সেই সময়কার সংসদের বিতর্ক থেকে জানা যাচ্ছে, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী ক্ষেপণাস্ত্র-র মতো একটি সমরাস্ত্র নির্মাণ ও তার উন্নতি সাধনের জন্য ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, *ডিএসএল*-কে প্রথমেই ২ লক্ষ টাকা (১৯৫৮-র মূল্যমানে) অনুদান দিয়েছিলো। ভারতের পরমাণু গবেষণা যেমন শুরু থেকেই 'গোপন কর্মসূচী'-র আওতায়, ঠিক তেমনি এবার থেকে 'গোপনীয়তার প্রয়োজনে' এই ক্ষেপণাস্ত্র গবেষক গোষ্ঠীর একটি নিরামিষ সাংকেতিক নাম দেওয়া হয়, 'স্পেশাল ওয়েপন ডেভলপমেন্ট টিম' বা *এসডব্লুডিটি*।

সমরাস্ত্র সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণাকে ফলিত রূপ দিতে গিয়ে বোঝা গেল, সব কাজ প্রকাশ্যে করতে গেলে ভারত সরকারকে অনেক আন্তর্জাতিক বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে। অন্যদিকে 'মহাকাশ গবেষণা'-র নামে এমন অনেক গবেষণার কাজ করা সম্ভব, যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ জনিত সমস্যার সম্মুখীন হবে না। ভারত সরকার তখন সিদ্ধান্ত নেয় যে গবেষণার একেবারে গোপন অংশটি কিছুতেই প্রকাশ্যে আনা হবে না এবং যে সমস্ত গবেষণার একটি নিরামিষ মৌলিক ভিত্তি রয়েছে, সেগুলি প্রকাশ্যে চালানো হবে। শুধু খেয়াল রাখা হবে যে প্রকাশ্যে গবেষণার বিষয়গুলির যেন দ্বৈত চরিত্র থাকে— অর্থাৎ সেই গবেষণার ফলকে সহজেই ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে।

নিয়ন্ত্রিত পরমাণু চুল্লি এবং নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র— এই দুই ক্ষেত্রের গবেষণার জন্য কিছু কিছু সমভাবাপন্ন প্রযুক্তির বিকাশের প্রয়োজন ছিল। অন্যদিকে, মহাকাশ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত কিছু কিছু মৌলিক গবেষণার ফলিত রূপ আবার নিয়ন্ত্রিত পরমাণু চুল্লি এবং নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণার জন্য একইভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ এই জাতীয় গবেষণাগুলি আসলে দ্বৈত চরিত্র বিশিষ্ট। এগুলি নিয়ে প্রকাশ্য মৌলিক গবেষণা শেষ বিচারে পারমাণবিক এবং ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত গোপন গবেষণার অনুপূরক হিসেবেই কাজ করবে।

এই প্রেক্ষিতটি মাথায় রেখে ভারত সরকার ১৯৬১ সালে মহাকাশ গবেষণা এবং 'শান্তির উদ্দেশ্যে' মহাকাশ অভিযানের বিষয়টি ভারতের পরমাণু মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। একই সঙ্গে বিক্রম সারাভাই প্রতিষ্ঠিত আমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ লেবরেটরি বা *পিআরএল*-কে ভারতের পরমাণু বিভাগের নিয়ন্ত্রণে একটি স্বশাসিত গবেষণা সংস্থা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত এই পিআরএল-এর মাধ্যমেই ভারত সরকার তার মহাকাশ গবেষণা সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ কেন্দ্রীভূত করে। এমনকি এই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয় পিআরএল-কে, যাতে দেশের মানুষ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি বুঝতে না পারে যে ভারত সরকার মহাকাশ গবেষণার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কত টাকা ব্যয় করে ঠিক কী কী ধরনের গবেষণা করছে।

ভারতের মহাকাশ গবেষণার বিষয়টি পরমাণু বিভাগের বা *ডিএই*-র হাতে যাওয়ার পর, *ডিএই* বিক্রম সারাভাইকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে ভারতের মহাকাশ প্রকল্প দেখাশোনা করার জন্য একটি ন্যাশনাল কমিটি অন স্পেস রিসার্চ গঠন করে। সময়টা ছিল ১৯৬২ সাল, যখন ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধ আসন্ন এবং যে সীমান্ত যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অপ্রস্তুত এবং অপেশাদারী অবস্থা প্রমাণিত হবে। ফলে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকেও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আরও 'উন্নত ও আধুনিক' করার চাপ ছিল, বিশেষত প্রতিবেশী দেশ চীন যখন উন্নত সেনাবাহিনীর ক্ষমতা প্রদর্শন করে দেখিয়েছে যে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে সমরাস্ত্র সংক্রান্ত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ফলে ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ প্রকল্পটির অগ্রাধিকার অনেকটাই বেড়ে যায়। কিন্তু ক্ষেপণাস্ত্র চাইলেই তা নির্মাণ করা সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন অনেক ধরনের মৌলিক গবেষণা, রকেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি। প্রধানত রকেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির একটি স্তরের উন্নতি ব্যতিরেকে নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ কার্যত অসম্ভব।

আন্তর্জাতিক স্তরের একটি বিশেষ পদক্ষেপ ভারতের এই দ্বৈত-চরিত্রের প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ এনে দেয়। শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে মহাকাশ গবেষণা সংক্রান্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি ঘোষণায় পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে একটি বিশেষ ধরনের রকেট নির্মাণের ক্ষেত্রে সুবিধাদানের কথা বলা হয়। এই ঘোষণার সুযোগ নিয়ে, রাষ্ট্রপুঞ্জের সহায়তায় ভারত নিরক্ষীয় অঞ্চলের বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিমাপের জন্য রকেট প্রকল্প গড়ে তোলার পরিকাঠামো গড়ে তোলে। এই জাতীয় রকেটকে পরিভাষায় বলা হল 'সাউন্ডিং রকেট'। শব্দটি নৌবাহিনী থেকে ধার করা। নৌ-বাহিনী তাদের পরিমাপ সংক্রান্ত কার্যকলাপকে ধোঁয়াশার মধ্যে রাখার অভিপ্রায়ে এই পদ্ধতির নাম দিয়েছে 'সাউন্ডিং'। তাই মহাকাশ বিজ্ঞানে পরিমাপের জন্য রকেটকে 'সাউন্ডিং রকেট' বলা হয়।

ভারতের ন্যাশনাল কমিটি অন স্পেস রিসার্চ মার্কিন দেশের 'নাসা'র সহায়তায় (এই 'নাসা' সংস্থার কাছেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির কাছ থেকে রাজেয়াপ্ত করা অতি উন্নত রকেট ও ক্ষপণাস্ত্র প্রযুক্তি ছিল) যন্ত্রাংশ থেকে জুড়ে সাউন্ডিং রকেট গড়ে তোলা এবং ক্ষেপণকেন্দ্র স্থাপনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। ভারতের বিজ্ঞানীদের মার্কিন দেশ এবং ফ্রান্সে পাঠিয়ে এই বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হয়। এছাড়াও ভারত ফ্রান্স থেকে রাডার এবং সাউন্ডিং রকেট এবং তার যন্ত্রাংশ আমদানির বিষয়ে চুক্তি করে। ততদিনে ফ্রান্স ভারতকে পরমাণু চুল্লির জ্বালানি দেবে বলেও চুক্তি করে। এই দুই চুক্তির মাধ্যমে ভারত মহাকাশ গবেষণা এবং পরমাণু গবেষণাকে একই ছাতার তলায় এনে দ্বৈত-চরিত্র সম্পন্ন প্রযুক্তি নির্মাণের গোড়াপত্তন করে।

এই সাউন্ডিং রকেটকে এই কারণে দ্বৈত-চরিত্রের প্রযুক্তির পরীক্ষাকেন্দ্র বলা হয় যে এই রকেটের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণের মাধ্যমে যেমন অপেক্ষাকৃত কম খরচায় কৃত্রিম উপগ্রহ এবং মহাকাশযানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির (যেমন মোটর, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, জ্বালানী ইত্যাদি) দক্ষতা, রূপায়ণযোগ্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতার পরীক্ষা করা যায়, তেমনি এই সমস্ত বস্তু দিয়েই যেহেতু ক্ষেপণাস্ত্রও নির্মিত হয়, তাই ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তিকে রূপায়ণযোগ্য করে তোলার কাজটিও প্রকাশ্যে সেরে ফেলা যায়!

এই সময় নাগাদ ভারত সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে মধ্যম পাল্লার ভূমি থেকে আকাশে ক্ষেপণ-যোগ্য নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র কেনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়— এই প্রকল্পের সাংকেতিক নাম দেওয়া হয় 'প্রজেক্ট ইন্ডিগো'। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ভেবেছিল, এমন একটি ক্ষে পণাস্ত্রের অংশগুলি খুলে ফেলে তাদের নির্মাণ-কৌশল আয়ত্ত করা যাবে এবং কেমনভাবে যন্ত্রাংশগুলি পরপর জুড়ে একটি সম্পূর্ণ ক্ষেপণাস্ত্র নির্মিত হয়েছে সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং'। কিন্তু দেখা গেল, সুইজারল্যান্ড থেকে এই ক্ষেপণাস্ত্র প্রকৌশল এবং পদ্ধতির দিক থেকে এতটাই জটিল এবং সূক্ষ্ম যে রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতিতে তার কৃৎ-কৌশল আয়ত্ত করতে প্রায় এক দশক লেগে যাবে। তাই সিদ্ধান্ত হয় যে রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জন্য অপেক্ষাকৃত কম জটিল রাশিয়ান এমএ-২ প্রজন্মের সমতুল্য ক্ষেপণাস্ত্র কেনা হবে! ফলে 'প্রজেক্ট ইন্ডিগো' পরিত্যক্ত হয়।

এই উদ্দেশ্যে ভাবা স্বয়ং নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নেহরুকে ভারতের পরমাণু প্রকল্প এবং মহাকাশ ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্পের আন্তঃসম্পর্কের বিষয়ে অবহিত করে মসৃণ ও নিরবচ্ছিন্ন অর্থলগ্নির বিষয়ে নিশ্চয়তা আদায় করেন। এরপর ভারত দুটি সমান্তরাল পদ্ধতিতে সাউন্ডিং রকেট প্রকল্প হাতে নেয়। একদিকে ভারতে লাইসেন্স-এর ভিত্তিতে ফ্রান্সের দ্বি-স্তর প্রযুক্তির সেন্টাউর রকেট নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে ভারত তার নিজস্ব সাউন্ডিং রকেট নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। এই বিষয়ে প্রথমে নির্দিষ্ট গবেষণার জন্য বেছে নেওয়া হয় কঠিন-পদার্থ ভিত্তিক জ্বালানির গবেষণা এবং ৫০ মিমি ব্যাসযুক্ত মোটর-এর নির্ভরযোগ্যতার গবেষণা। ভারত শেষ পর্যন্ত দেশীয় প্রযুক্তিতে ৫০ মিমি ব্যাসের রোহিনী-০০ প্রজন্মের মোটর বানাতে সক্ষম হয়। এই দুই ক্ষেত্রের গবেষণার ফলে ভারত রোহিনী প্রজন্মের সাউন্ডিং রকেট বানানোর দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলে।

একই চুক্তির ফলে সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যম পাল্লার ভূমি-থেকে-আকাশে ক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ভারতে এসে পৌঁছোয় এবং তা অতি দ্রুত ভারতীয় সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে পড়ে। এই ক্ষেপণাস্ত্র কেবল ১৩০ কেজি কিগ্রা সাবেকি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক বহনে সক্ষম ছিল।

নভেম্বর ২০, ১৯৬৭ ভারত তার প্রথম সাউন্ডিং রকেট, রোহিনী-৭৫ ক্ষেপণ করতে সক্ষম হয়। এই রকেট উৎক্ষেপণের

মাধ্যমে ভারতের বিজ্ঞানীরা এই প্রথমবারের জন্য বাস্তব ক্ষেত্রে রকেটের নক্সা, কার্যকারিতা, রকেটে কঠিন জ্বালানি ভরা এবং বাস্তবে উড়ন্ত বস্তুকে পৃথিবী থেকে দূরপাল্লার প্রযুক্তির সাহায্যে নিয়ন্ত্রণের কৌশল আয়ত্ত করার প্রয়াস পান।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতের পরমাণু মন্ত্রক অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটাতে দ্বিতীয় রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পাশাপাশি তারা দূরসঞ্চার পদ্ধতিতে তথ্য আদান-প্রদান এবং তথ্যভিত্তিক নিয়ন্ত্রণের গবেষণা চালু করে। ১৯৭১ সালে দ্বি-স্তর রোহিনীর পরিবর্তে ত্রি-স্তর রোহিনী উৎক্ষেপণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়। এর জন্য অর্থবরাদ্দের পরিমাণ ধরা হয় ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা (১৯৬৫ সালের মূল্যমানে) এবং সঞ্চার ব্যবস্থা সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আরও ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

১৯৬৯ সালে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ২২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৫ই আগস্ট ভারতের পরমাণু বিভাগ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা বা ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অরগানাইজেশন বা সংক্ষেপে *ইস্‌রো* গঠন করেন। এই সংগঠনটি ভারতের মহাকাশ গবেষণার সর্বোচ্চ সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলা হয়। জার্মানির সহযোগিতায় কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ কেন্দ্র গড়ার কাজ শুরু হয়। দূরপাল্লার উৎক্ষেপণের মূল পরিকাঠামো গড়ে ওঠার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নির্দেশে দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের এক গোপন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। ১৯৭০ সালের নভেম্বর নাগাদ ঠিক হয় যে আগামী চার বছরের মধ্যেই ৫০০ কেজি বিস্ফোরক বহন-ক্ষম এবং ৪০০০ কিমি পাল্লার দূর-লক্ষ্যভেদে সক্ষম ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র গড়ে তোলা হবে। ১৯৭১ সালে এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কঠিন-পদার্থ-জাত জ্বালানি প্রস্তুত করার জন্য আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে শ্রীহরিকোটায় একটি রকেট জ্বালানি কারখানা গড়ে তোলা হয়।

মহাকাশ গবেষণা ও ক্ষেপণাস্ত্র

দ্বৈত-চরিত্রের ফলিত গবেষণা যখন একটা স্তর পর্যন্ত অগ্রসর হয়, তখন সেই গবেষণালব্ধ ফলকে সংহত করার প্রয়োজন দেখা যায়। ১৯৭২ সালে ভারত সরকার আমেদাবাদের *পিআরএল*-এর মাধ্যমে মহাকাশ গবেষণা সংক্রান্ত অর্থ ও নিয়ন্ত্রণ-এর বিষয়টির পরিবর্তে মহাকাশ গবেষণা সংক্রান্ত সম্পূর্ণ একটি বিভাগ তৈরি করে তার ওপর যাবতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করে।

এই প্রকল্পটি জ্ঞান-ভিত্তিক হওয়াতে প্রথমেই প্রয়োজন পড়ে সুশিক্ষিত মানব-সম্পদের। এক্ষেত্রে ভারত সরকার মার্কিন দেশের আদলে যেমনভাবে পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলো, মূলত সেই আদর্শটিই অনুসরণ করে। ডিফেন্স রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ল্যাবরেটরি আগ্রাসী পদ্ধতি অনুসরণ করে সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা সংস্থা থেকে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের চাকরি দেওয়া শুরু করে। যখন এই কর্মসংস্থান প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়, তখন এই সংস্থায় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের সংখ্যা ছিলো কম-বেশি ৪০০। আর উদ্যোগ গ্রহণের মধ্যপর্বে ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ২৫০০ জন।

পার্শী বণিক টাটার আনুকূল্যে যেমন বোম্বাই-এর টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্টামেন্টাল রিসার্চ মৌলিক গবেষণার নামে, নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্য প্রকাশ্যে রেখে নিউক্লিয়ার বোমা বানানোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গড়ে তোলে, ঠিক তেমনি ব্যাঙ্গালোর (অধুনা ব্যাঙ্গালুরু) শহরের টাটা সংস্থার অন্য একটি গবেষণাগার, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সকে মহাকাশ গবেষণার এই প্রকল্পের জন্য ভরকেন্দ্র হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এই সংস্থার এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিভিন্ন বিজ্ঞান বিভাগকে মহাকাশ প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়।

বিজ্ঞানী ভাবা যেভাবে পরমাণু গবেষণার যাবতীয় বিষয় (গবেষণা, প্রযুক্তি, পঠন-পাঠন, প্রশিক্ষণ, পরমাণু সংক্রান্ত খনিজ সহ অন্যান্য বস্তু) ভয়ানক কেন্দ্রীভূত করে সামরিক সুরক্ষায় আওতায় নিয়ে আসেন, প্রায় সেই আদলেই অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান ভারতের মহাকাশ গবেষণার যাবতীয় বিষয় কেন্দ্রীভূত করে তোলেন। এই লক্ষ্যে তিনি তিরুবনন্তপুরম-এর স্পেস সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি সেন্টার, কেরালার থুম্বা-র রকেট প্রপালসান প্ল্যান্ট, রকেট ফেব্রিকেশন ফেসিলিটি এবং অন্ধ্রের শ্রীহরিকোটার হাই অলটিটিউড রেঞ্জকে একীভূত করে, তিরুবনন্তপুরমকে মুখ্য সদর ক'রে বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার বা সংক্ষেপে *ভিএসএসসি* গঠন করেন। আবার কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপন সংক্রান্ত যাবতীয় ভারতীয় সংস্থাগুলিকে একীভূত করে আহমেদাবাদ ভিত্তিক স্যাটেলাইট এপ্লিকেশন সেন্টার গঠন করেন। এই দুটি সংস্থার যুগ্ম প্রচেষ্টায় ভ্যালিয়েন্ট ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (সাংকেতিক নাম) নির্মাণের গোপন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়।

কিন্তু ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তি যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত না হওয়ায় নিরামিষ মহাকাশ গবেষণার বিষয়টি দেখিয়ে ভারত সরকার ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত বেশ কিছু মোটর এবং স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আমদানি করে। এসব যে দ্বৈত-চরিত্রের প্রযুক্তি সেটা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি যে ভারত সরকার তাদের আমদানি করা এই সমস্ত যন্ত্রাংশ তাদের বোমারু বিমানে সংলগ্ন করে এইসব যন্ত্রাংশের কার্যকারিতার পরীক্ষায় লিপ্ত হয়।

ইতিমধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে আমদানি করা মধ্যম পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র-র রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়। এই কাজটির জন্য অর্থ বরাদ্দ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে হয় ১৬ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৫ কোটি টাকা আমদানি করতেই লেগে যায়। এর মাধ্যমে ভারত ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তির নানা দিক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে।

এতো কিছু করেও ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের গোপন প্রকল্পটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে কখনই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে প্রাপ্ত ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ভারতীয় সেনাবাহিনী ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে (১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশ) ব্যবহার করে। যে ১১টি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল তার কোনোটাই লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছিও পৌঁছায়নি। পরীক্ষামূলক ক্ষেপণেও দেখা যায় যে ক্ষেপণাস্ত্রগুলি লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করতে ব্যর্থ হয়েছে। সেনাবাহিনী তাই ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্প বন্ধ করে দিয়ে সরাসরি আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ক্ষেপণাস্ত্র কেনার সুপারিশ করে।

ক্ষেপণাস্ত্র কথা : দ্বৈত প্রযুক্তির ছদ্মবেশ

ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ নিয়ে ভারতের সেনাবাহিনীর মতো প্রতিরক্ষা মন্ত্রকও প্রায় একই সিদ্ধান্তে আসতে থাকে। ঠিক হয়, ভারত যেমন ব্রিটেনের কাছ থেকে 'ফেলে দেওয়া' প্রযুক্তি আমদানি করে অন্তত পোখরান পরমাণু বোমা বিস্ফোরণে পৌঁছেছিলো, তেমনি ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনের জন্যও বিদেশের বাতিল প্রযুক্তি-র সাহায্য নিতে হবে।

আমলা-বিজ্ঞানীরা এবং যে সমস্ত বিদেশি সংস্থাগুলি এই সব আমলা-বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষিত করে ভারতে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ দেখার 'বিশেষজ্ঞ'-র তকমা দিয়ে পাঠিয়েছিল, তারা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। রাজনৈতিক নির্বাসন থেকে সদ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাওয়া শ্রীমতী গান্ধীর কাছে 'গরিবি হটাও'-এর পরবর্তী শ্লোগান হিসেবে 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে স্বনির্ভরতা অর্জন' একটি ঝকমকে শ্লোগান হিসেবে হাজির হয়। এই চমকপ্রদ শ্লোগানটি জনপ্রিয় করার অভিপ্রায়ে ইন্দিরা গান্ধী তথাকথিত 'আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্র' (যেমন নিউক্লিয়ার বিজ্ঞান এবং মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) বেছে নেন। পোখরানের পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ফল হিসেবে পরমাণু গবেষণা ও প্রযুক্তিগত আমদানির ক্ষেত্রে ভারতের বিরুদ্ধে নানা রকম নিষেধাজ্ঞা জারি হয় এবং এই ক্ষেত্রটি সহ সংশ্লিষ্ট নানান ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও স্বনির্ভর বিজ্ঞান-প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়।

শ্রীমতী গান্ধী এ পি জে আবদুল কালামের নেতৃত্বে (শ্রীমতী গান্ধী তাঁকে ইস্‌রো-র একটি প্রয়োজনীয় বিভাগের প্রধান হিসেবে উন্নীত করেন) কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ প্রকল্পের সূচনা ঘোষণা করেন। শুনতে বিষয়টি অসামরিক ও পরিষেবামূলক মনে হলেও আদতে এটি ছিলো দ্বৈত-চরিত্রের। কালাম এক সময় নিজেই বিষয়টি ফাঁস করে দিয়ে বলেন যে এই অসামরিক কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ প্রকল্পটি আসলে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত গবেষণা। বস্তুত, ভারতের প্রথম প্রজন্মের *অগ্নি* ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্পটি এই গবেষণারই ফল।

সতীশ ধাওয়ানও *ওয়াশিংটন পোস্ট* পত্রিকার সাংবাদিককে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, "যে কোনও দেশ, যারাই মহাশূন্যের নির্দিষ্ট একটি কক্ষে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করতে পারে, তারাই আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ এবং উৎপেক্ষণ করতে পারে। ভারতও কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ সংক্রান্ত গবেষণার মাধ্যমে এখন আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনের জন্য অনেক দূর এগিয়ে গেলো।" (*ওয়াশিংটন পোস্ট*, ১৮ জুলাই, ১৯৮০)।

এই বিবৃতি নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে হইচই পড়ে গেলে শ্রীমতী গান্ধী প্রথমে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তিন প্রধানকে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে আশ্বস্ত করেন যে কূটনীতির খাতিরে সরকার বিবৃতিতে যাই বলুক না কেন, ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির এই প্রকল্প আরও দ্রুততার সঙ্গে রূপায়ণ করা হবে। তার পরেই, ২৫শে জুলাই ১৯৮০, শ্রীমতী গান্ধী দিল্লিতে একটি সরকারি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন যে ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেবল মৌলিক গবেষণাতেই সীমাবদ্ধ। ভারতের মহাকাশ গবেষণা প্রকল্পকে সামনে রেখে ভারত ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণা চালাচ্ছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র মতোই ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রগুলিও নিজেদের সংহত করার পর এই সংক্রান্ত গবেষণা, উৎপাদক ও উদ্ভাবন কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে একের পর এক সংস্থাকে অধিগ্রহণ করে সেগুলিকে সামরিক গোপনীয়তার আওতায় নিয়ে আসে। চণ্ডীগড়ের সেমিকন্ডাকটর কমপ্লেক্স লিমিটেডকে কার্যত অধিগ্রহণ করে ভারত সরকার এই সংস্থার মাধ্যমে মার্কিন প্রযুক্তিতে অতি বৃহৎ অর্ধপরিবাহী-ভিত্তিক ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, এই পদক্ষেপটিও দ্বৈত-প্রযুক্তি আহরণের একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। পরবর্তীকালে ভারতের যাবতীয় ক্ষেপণাস্ত্র এই উৎপাদনের সুবিধা গ্রহণ করেছে। ভারতের নিউক্লিয়ার যুদ্ধাস্ত্র গবেষণা এবং ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণার মধ্যে যোগসূত্র এবং সমন্বয় সাধনের জন্য ১৯৭৪-এর পোখরান-১ বিস্ফোরণেব অন্যতম নেপথ্য নায়ক পরমাণু শক্তি কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক রাজা রমান্না, *ডিআরডিও*-র তৎকালীন চেয়ারম্যান আবদুল কালামকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণার গতিকে পুনরুজ্জীবিত করার দায়িত্ব দেন।

১৯৮১ সালে অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর একটি সাক্ষাৎকারে পুনরায় বলেন যে "...রকেট প্রযুক্তি দু-দিকে ধারওয়ালা ছুরির মতো। এটা দিয়ে হত্যাও করা যায় আবার সব্জিও কাটা যায়। ছুরির মতো রকেটও জানে না তাকে কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে। যে ব্যবহার করবে সেই ঠিক করবে সে এটিকে ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে কিনা।" (*ওয়াশিংটন পোস্ট*, সি-৪, ডিসেম্বর-৪, ১৯৮১)।

রামান্না দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে আবদুল কালাম (আবদুল কালাম তাঁর আত্মজীবনীমূলক পুস্তক *অগ্নিপক্ষ*-এ বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে 'শান্তির উদ্দেশ্যে মহাকাশ গবেষণা' সংক্রান্ত

মিথ্যার ফানুস নিজেই ফাটিয়ে দিয়েছেন) সেনাবাহিনীর তিন প্রধানের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে তাঁদের চাহিদা কী সেটি সরাসরি জেনে নিয়ে ভারতের মহাকাশ গবেষণার মাধ্যমে নানান ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণার কাজ প্রকাশ্যে শুরু করে দেন। এর ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে এই সমস্ত 'বোমারু-বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ-আমলা'-দের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। সেনা-বাহিনী এই সমস্ত গবেষণালব্ধ 'প্রোটো-টাইপ' অস্ত্রাদি পরীক্ষা করে তাদের মতামত দিতে সম্মত হয়। ভারতের সমস্ত বড় বড় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলির প্রধানদের একজোট করে একটি কমিটি তৈরি করা হয়, যারা সেনাবাহিনীর বরাত পাবে এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ও গোপনীয়তা বজায় রাখবে এই প্রতিশ্রুতিতে সেনাবাহিনীর জন্য এ উৎপাদন করবে বলে চুক্তিবদ্ধ হয়।

কালামের নেতৃত্বে এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে ১৯৮২ সালে ভারতের সংসদে একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন যে ভারত ক্ষেপণাস্ত্র-ভিত্তিক একটি দীর্ঘকালীন প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা নির্মাণ করেছে। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় ভারতের যে 'নিউক্লিয়ার ডকট্রিন' প্রচারিত হয়, তা এই পরিকল্পনারই একটি পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ, যেখানে সাবেকি ক্ষেপণাস্ত্রের সঙ্গে পরমাণু বোমা এবং অন্যান্য পারমাণবিক শক্তি-ভিত্তিক অস্ত্রসম্ভারও যুক্ত হয়েছে)। তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সংসদে একটি বিবৃতি থেকে জানা যায় যে ১৯৮২ সালের শেষ দিনেই ভারতে ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী এবং ভূমি-থেকে-ভূমি ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের পরিকাঠামো তৈরি হয়ে গেছে।

১৯৯৮ সালে আবদুল কালাম পাঁচটি ভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করেন। সেই পাঁচটি প্রকল্প যথাক্রমে *পৃথ্বী, ত্রিশূল, অগ্নি, আকাশ* এবং *নাগ*। 'মৌলিক এবং শান্তির জন্য মহাকাশ গবেষণা'-র ছদ্ম আবরণ কালাম নিজেই ঘুচিয়ে দেন। তিনি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন যে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা তাদের *রোহিনী*-পরবর্তী কৃত্রিম উপগ্রহ-সদৃশ বস্তুর জন্য যে তরল-জ্বালানির ইঞ্জিন নির্মাণ করেছে *পৃথ্বী* ক্ষেপণাস্ত্র সেটি ব্যবহার করবে, এবং মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র তারপর এই ইঞ্জিনটিকে বিভিন্ন প্রজন্মের *পৃথ্বী* ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য উপযোগী করে নির্মাণ করবে।

১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে ভারতের মন্ত্রীসভা সরকারিভাবে ভারতের নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণাকে স্বীকৃতি দেয় এবং সামরিক খাত থেকে ইস্‌রো-কে বেশ কিছুটা অর্থ (সামরিক খাত বলে পরিমাণ জানা যায়নি) এবং ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্পকে ৩৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, স্বল্প-পাল্লার নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রগুলি হবে *পৃথ্বী*, মধ্যম পাল্লার *অগ্নি*, ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র *নাগ*, ভূমি-থেকে-আকাশ, স্বল্প দূরত্ব এবং স্বল্প উচ্চতার ক্ষেপণাস্ত্র *ত্রিশূল* এবং দূর-মধ্যম পাল্লার ভূমি-থেকে-আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র *আকাশ*। চণ্ডীগড়ের সেমি-কন্ডাকটার কমপ্লেক্স লিমিটেড তাদের কারখানার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে এই পাঁচ ধরনের নিয়ন্ত্রণের জন্য যে অতি বৃহৎ মাত্রার সংযুক্ত বৈদ্যুতিন সার্কিট প্রয়োজন হবে তা নির্মাণের, পরীক্ষার এবং ক্রমাগত উন্নতি সাধনের পরিকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন করে। ক্ষেপণাস্ত্রগুলি উৎক্ষেপণের জন্য উড়িষ্যার বালেশ্বরের কাছে বালিয়াপাল-কে জাতীয় পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয় এবং বহু মানুষ ঐ অঞ্চল থেকে উচ্ছেদ হয়ে যান। অনেকেরই হয়তো বালিয়াপাল-চাঁদিপুর-ভোগরাই অঞ্চলের উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের গৌরবময় দীর্ঘ সংগ্রামের কথা মনে আছে।

ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্পের সফল রূপায়ণের উদ্দেশ্যে কালাম আবার দ্বিতীয় বারের জন্য বোমারু-বিজ্ঞানীদের খোঁজে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্বশাসিত গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে সফর শুরু করেন এবং অচিরেই প্রায় ৩০০ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদকে এই যুদ্ধ-গবেষণায় সামিল করতে সক্ষম হন।

অন্যান্য সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে ১৯৮৭ থেকে কালাম *পৃথ্বী* এবং অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্রগুলির পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তখনও এদেশের গবেষণা এবং প্রযুক্তি-সক্ষমতা এতদূর এগোয় নি যে ভারতে উৎপাদিত যন্ত্রপাতি বা প্রযুক্তি দিয়ে এই লক্ষ্যমাত্রা বজায় রাখা সম্ভব হবে। তাই আবার দ্বৈত-প্রযুক্তির আশ্রয় নেওয়া হয়। ভারতের জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রকে সামনে রেখে পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতির্বিদ্যার মোড়কে দ্রুত এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমপিউটার, ত্রি-অক্ষ পরিমাপ যন্ত্র, সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নানা জাতের পসরা ক্রয় করা হয়, যেগুলির সামান্য পরিবর্তন করলেই এগুলিকে ক্ষেপণাস্ত্রে (*অগ্নি, পৃথ্বী* বা *ত্রিশূল*-এ) ব্যবহার করা সম্ভব।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এর দুটি গবেষক দল যথাক্রমে *পৃথ্বী* ক্ষেপণাস্ত্রর জন্য 'নিয়ন্ত্রণ অ্যালগরিজম' এবং ক্ষেপণাস্ত্রের নির্ভুলভাবে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করার সম্ভাব্য কক্ষপথ ও অন্যান্য বিষয় কম্পিউটার প্রোগ্রামের মারফত সম্পন্ন করার (পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'কমপিউটার সিমিউলেশন') কমপিউটার কোড নির্মাণ করেন। আইআইটি খড়গপুরে *আকাশ*-এর জন্য 'মিলিমেট্রিক অ্যান্টেনা' নির্মিত হয়।

ভারত ততদিনে বহনযোগ্য ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করার মধ্য দিয়ে হায়দ্রাবাদের ভারত ডায়নামিক্স লিমিটেডকে ভারতের ভবিষ্যতের সমস্ত ধরনের সম্ভাব্য ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র এবং তার যন্ত্রাংশ উৎপাদনে সক্ষম করে তুলেছে। ১৯৮৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ভারত সর্বপ্রথম *ত্রিশূল* (ভূমি-থেকে-আকাশ) ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণে সফল হয়।

এতদিন স্বল্প পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির দিকেই ভারত সরকারের মনোযোগ ছিল। কিন্তু ইস্‌রো-র বিজ্ঞানীরা সৈন্যবাহিনীকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, ভারত সরকার যদি মহাশূন্য পাড়ি

দেওয়ার জন্য মহাকাশযান নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয়, তাহলে ঐ সমস্ত মহাকাশযান নির্মাণ, উড়ান, উৎক্ষেপণ, নিয়ন্ত্রণ এবং মহাকাশযান প্রেরিত নানান চিত্র এবং তথ্য থেকে আন্তঃমহাদেশীয় দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণও সম্ভব। *ত্রিশূল* এবং *অগ্নি*-র প্রাথমিক সাফল্য দেখে উৎসাহিত হয়ে ভারত সরকারও ১৯৯০ থেকে মহাকাশযান-নির্ভর মহাকাশ গবেষণার প্রকল্প হাতে নেয়।

১৯৮৬ সালের শেষে ভারত মার্কিন দেশ থেকে ক্রে সুপার কমপিউটার কিনতে সক্ষম হয়। বাঙ্গালুরুর সুপার কমপিউটার রিসার্চ সেন্টার নামক একটি নিরামিষ স্বশাসিত সংস্থার মাধ্যমে ইস্‌রো এবং প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা কমপিউটার এডেড ডিজাইন-এর মাধ্যমে ক্ষেপণাস্ত্রর অনেকগুলি সম্ভাব্য নক্সা তৈরির জন্যকমপিউটার এডেড ডিজাইন-এর মাধ্যমে ক্ষেপণাস্ত্রর অনেকগুলি সম্ভাব্য নক্সা তৈরির জন্য এই কমপিউটারটির ব্যবহার শুরু করে । ১৯৮৮ সালে এসে দেখা যায় যে, ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা কেন্দ্র এবং ইস্‌রো-র তত্ত্বাবধানে থাকা ১৯টি গবেষণাক্ষেত্র ছাড়াও সারা দেশের আরও ২১টি স্বশাসিত সংস্থা, ৬টি বেসরকারি সংস্থা এই ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন প্রকল্পের অংশীদার হয়ে উঠেছে। ১৯৮৯-এ ইস্‌রো-র 'মহাকাশ গবেষণা'র ফল হিসাবে ভারতের বেশ কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ক্ষেপণাস্ত্রর জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি এবং তরল ও কঠিন জ্বালানি উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করেছে।

১৯৮৯ সালের ২২ মে ক্ষেপণাস্ত্র রেঞ্জ থেকে *অগ্নি* ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ হয়। সিআইএ-র প্রধান একটি বিবৃতিতে বলেন ভারত সরকার থার্মোনিউক্লিয়ার বোমার প্রস্তুতি নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, সে তার ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্পকে নিউক্লিয়ার-সক্ষম করে তুলতে চাইছে। এ নিয়ে সব জল্পনার অবসান হয় যখন ভারতের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী কে সি পন্থ মহাশয় এক বিবৃতিতে বলেন যে, ভারতের *অগ্নি* ক্ষেপণাস্ত্রের সাবেকি বিস্ফোরক ছাড়াও অন্যান্য 'আধুনিক' মারণাস্ত্র বহনের ক্ষমতা রয়েছে।

১৯৯০ সালে ডুবোজাহাজ থেকে নিক্ষেপযোগ্য মধ্যম পাল্লার জল-থেকে-আকাশ সাগরিকা ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত পাকা হয়। পাশাপাশি, দৃষ্টিশক্তির বাইরে বিচরণকারী লক্ষ্যবস্তু ভেদের জন্য আকাশ-থেকে-আকাশ প্রজাতির *অস্ত্র* ক্ষেপণাস্ত্রের নক্সা তৈরির সিদ্ধান্ত হয়।

চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন (১৯৯০-এর শেষে) সিদ্ধান্ত হয় যে এখন থেকে নিউক্লিয়ার সংক্রান্ত যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে সেনাবাহিনীর তিন প্রধানেরও পরামর্শ নেওয়া হবে। এ সিদ্ধান্ত আজও বলবৎ রয়েছে। ১৯৯২ সালে ইস্‌রো-র মুখ্য উৎপাদক, এরোনটিক্যাল ডেভলপমেন্ট এস্টাবলিশমেন্টকে 'সাগরিকা' ক্ষেপণাস্ত্রর মূল কাঠামো নির্মাণের ভার ন্যস্ত করা হয়। তারা বলে ইস্‌রো-র জন্য তারা যে দ্বৈত-প্রযুক্তি-ভিত্তিক কাজ করেছিলো, সেই অভিজ্ঞতার কারণেই তারা *সাগরিকা*-র বরাত পেয়েছে।

নরসীমা রাও-এর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় ভারতে সরকারিভাবে বিশ্বায়ন চালু হওয়ার পর যুদ্ধাস্ত্র বিষয়ক যাবতীয় গোপনীয়তার বেড়াজাল বজায় রাখার আর কোনো দায় ভারত সরকারের রইলো না। ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে এতদিন পর্যন্ত সরকারিভাবে ঘোষিত 'শান্তির জন্য মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র' ইস্‌রো *অগ্নি* ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য জ্বালানি তৈরি করবে, যাতে *অগ্নি* ক্ষেপণাস্ত্রকে দ্রুত ভারতীয় সেনাবাহিনীর অস্ত্রসম্ভারের অন্তর্গত করা সম্ভব হয়। ১৯৯৩ সালের একটি রিপোর্ট (*হিন্দুস্থান টাইম্‌স*, *২২.৫.১৯৯৩*) থেকে জানা যায় যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১১তম কর্পস-এর যে অংশটি পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর রয়েছে, তাদের অস্ত্রভাণ্ডারে *পৃথ্বী* ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। অক্টোবর ১৯৯৩-এর মধ্যেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর আর্টিলারি বিভাগের নিয়মিত অস্ত্ররূপে *পৃথ্বী* অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৯৪-এর গোড়ায় ভারত সরকার ২২০ কিমি পাল্লার আন্তঃদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্পের কথা ঘোষণা করে। সেনাবাহিনীর চিফ্ অফ স্টাফ শ্রী হরওয়ান্ত সিং বলে বসেন যে *অগ্নি*-কে নিউক্লিয়ার অস্ত্র বহন-সক্ষম না করে তুলতে পারলে সেনাবাহিনীর এই ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে খুব একটা উৎসাহ নেই। ফলে আবার পরমাণু গবেষণা ও মহাকাশ গবেষণার মধ্যে গাঁটছড়া আরো দৃঢ় হওয়ার যে অবস্থার সৃষ্টি হয় যা আজও চলছে। ইতিমধ্যে কেবলমাত্র *পৃথ্বী* ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা সজ্জিত ভারতের সেনাবাহিনীর মধ্যে ৩৩৩-তম ক্ষেপণাস্ত্র গোষ্ঠী গঠিত হয়।

৩০শে জুন, ১৯৯৭, ভারতের সেনাবাহিনীর ভূতপূর্ব চিফ-অফ স্টাফ জেনারেল সুন্দরজী মন্তব্য করেন যে, মহাকাশ গবেষণার ফল হিসেবে আমরা সাবেকি অস্ত্র-সজ্জিত *পৃথ্বী* ক্ষেপণাস্ত্র পেয়েছি। নিউক্লিয়ার গবেষণার ফল হিসেবে আমরা যে কোনও সময় *পৃথ্বী*-কে নিউক্লিয়ার অস্ত্র-বহন-সক্ষম করে তুলতে পারি (*ইন্ডিয়া টুডে*, জুন ৩০, ১৯৯৭, পৃ. ৭৩)।

আগস্ট ১৯৯৭-তে ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রর নিউক্লিয়ার বোমা উৎপাদন গোষ্ঠী *পৃথ্বী* ক্ষেপণাস্ত্রে বহনযোগ্য বোমার প্রোটো-টাইপ উৎপাদন করে। মূল বোমা ১৯৯৮-এর গোড়ায় নির্মাণ সম্ভব হবে বলে তাঁরা জানান। ১৭ই মে, ১৯৯৮ পোখরান-২ বিস্ফোরণের মাধ্যমে ভারত সরকারিভাবে 'শান্তির জন্য পরমাণু' প্রকল্প ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সদর্পে বোমার জন্য পরমাণু প্রকল্পের কথা ঘোষণা করে। *পৃথ্বী*-র একটি পরিমার্জিত রূপ, *ধানুষ* ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। *ধানুষ* প্রকল্পের যাবতীয় প্রযুক্তি এসেছিল ইস্‌রো-র পরপর কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ থেকে।

১৯৯৯-এর এপ্রিল মাসে আবদুল কালাম বলেন যে, *অগ্নি*-২ ক্ষেপণাস্ত্র নিউক্লিয়ার অস্ত্র বহনে সক্ষম, বস্তুত ১৯৯৮-এর মে মাসে যে পরীক্ষামূলক পোখরান-২ বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল তার সমতুল্য ক্ষমতার নিউক্লিয়ার বোমা বহনে *অগ্নি*-

২-এর বর্তমান নক্সাই যথেষ্ট। ১৯৯৯-এর মে-জুন মাসে যে কার্গিল সংঘর্ষ ঘটে, তাতে একটি *অগ্নি*-২ ক্ষেপণাস্ত্রে সত্যি সত্যিই নিউক্লিয়ার বোমা যুক্ত করা হয়।

শেষ কথা

ভারত সরকার ক্রমাগত তার ক্ষেপণাস্ত্রর বৈচিত্র্য বাড়িয়েই চলেছে। এই প্রতিটি উন্নতি ঘটছে তার নিরামিষ মহাকাশ গবেষণার হাত ধরে। *পিএসএলভি, এএসএলভি* এবং অন্যান্য মনুষ্যহীন বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত এবং স্বনিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তির যত উন্নতি ঘটছে, জ্বালানি, মোটর, বুস্টার এবং ক্ষেপণ-পরিবহন ব্যবস্থার যত উন্নতি হচ্ছে, ততই সেই সমস্ত দ্বৈত-চরিত্রের প্রযুক্তিগুলি ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে।

২০১১ সালের ১১ই জুন ভারতের তৎকালীন চিফ এয়ারমার্শাল পি ভি নায়েক সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন যে, 'ভারতের এখনই আগ্রাসী উপায়ে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতে মন দিতে হবে, ক্ষেপণাস্ত্রর সীমা বাড়িয়ে ১০,০০০ কিমি বা তারও বেশি করা জরুরি' (*হিন্দুস্তান টাইম্‌স্*, ১০.৬.২০১১)। এই কাজ করতে গেলে যে গবেষণা ও প্রযুক্তি প্রয়োজন তারই মহড়া হিসেবে ভারতের চন্দ্রায়ন প্রকল্প, মঙ্গল-অভিযান প্রকল্প। একথা সত্যি যে মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা একটি দুমুখো ছুরি— বর্তমানে তা যাদের হাতে তারা সেটির মারণ ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই একই প্রযুক্তি মানবকল্যাণে ব্যবহার করা সম্ভব। যে সমাজ-বিপ্লব মহাকাশ প্রযুক্তির এই কল্যাণকর দিকটি উন্মুক্ত করবে, তার অপেক্ষায় থাকা আর ধ্বংসের বিরুদ্ধে সরব হওয়া বর্তমান মহাকাশ ও পরমাণু বিজ্ঞানীদের অবশ্য-কর্তব্য।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে সাধারণভাবে বিশ্বে ও বিশেষভাবে আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি যেভাবে এগিয়ে গেছে তাকে মানব কল্যাণে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেকটাই বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। অনেক দেশে এই কাজটি সামান্য হলেও সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তা করার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গবেষণার দিশা পরিবর্তনের। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এই গবেষণার বর্তমান দিশ জনবিরোধী এবং গোপনীয়তার আবরণে ঢাকা। যে সমস্ত বিষয়ে গবেষণা প্রত্যক্ষভাবে মানবকল্যাণে নিয়োজিত, সেই ক্ষেত্রগুলির গবেষণায় অর্থও কম, উৎসাহ দেওয়ার পরিবর্তে সেগুলিকে প্রায় ব্রাত্য করে রাখা হচ্ছে। যে সব গবেষণায় বেআইনি অর্থ লেনদেন রয়েছে, কোনও সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই, সেইগুলি এখন শাসকদের চোখের মণি। ঠেক যেমন সাধারণ মানুষের টাকা আত্মসাৎ করে ঘুষ আর কিক-ব্যাকের রমরমা, ঠিক তেমনি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গবেষণা ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষের টাকা আত্মসাৎ করে যুদ্ধ-গবেষণা চলছে। এই সমস্ত গবেষণা দেশকে আত্মনির্ভর করার বদলে পরনির্ভর করে তোলে। পরাধীন ভারতে বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদরা জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার দেশীয় ধারাকে পুষ্ট করে স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, দেশের বর্তমান নীতি-নির্ধারকরা তার বিপরীত পথে চলেছেন।